দুই তিন চার এক

ইসলামে বহুবিবাহ

ড. আবু আমিনাহ বিলাল ফিলিপ্স
ড. জামিলা জোন্স

SEAN
PUBLICATION

সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

সূচি

প্রকাশকের কথা ৯

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা ১৩

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা ১৫

প্রথম অধ্যায়

পূর্ব কথা ১৭

একক বিবাহ পদ্ধতি ১৮

খ্রিস্টধর্মে বহুবিবাহ ১৯

জীবনযাত্রার ধরন—আত্মবিসর্জন ২০

একক বিবাহ পুরুষদের বাড়তি সুযোগ করে দেয় ২৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামে বিবাহ ২৫

ইসলামে বিবাহ ২৬

অস্থায়ী সম্পর্কের চেয়ে বিয়ে উত্তম ২৭

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ২৮

পুরুষের দায়-দায়িত্ব অধিক ৩৪

স্ত্রীর কর্তব্য ৩৬

স্বামীর প্রতি আনুগত্য ৪০

তৃতীয় অধ্যায়

তা'আদ্দুদ: বহুবিবাহ ৪৬

তা'আদ্দুদ: বহুবিবাহ ৪৭

পুরুষদের জন্য বহুবিবাহের বৈধতা ৪৮

নারীদের সংখ্যাধিক্য ৫১
পুরুষের জৈবিক তাড়না এবং পর্দার বিধান ৫২
বহুবিবাহের শর্তসমূহ: ৫৮

চতুর্থ অধ্যায়

বহুবিবাহের দাম্পত্য বিধান ৬২
স্ত্রীদের মধ্যে বণ্টন ৬৩
সমতা রক্ষার মূলনীতি ৬৫
বণ্টনের শুরু ৬৭
সময়ের বণ্টন ৬৮
স্ত্রীদের সময় পাওয়ার অধিকার ৭১
নববধূর সময় পাওয়ার অধিকার ৭৪
বৈবাহিক অধিকার ৭৫
সময় পূরণ করে দেওয়া ৭৭
অধিকার ছেড়ে দেওয়া ৮১
বাসস্থানের অধিকার ৮২
ভ্রমণের অধিকার ৮৪
পোশাক ও অন্যান্য ব্যয়ভার বহন ৮৬
স্ত্রীদেরকে উপহার দেওয়ার নিয়ম ৮৭
উপসংহার ৮৮
গ্রন্থতালিকা ৯৮
শব্দকোষ ১০০
হাদীসের তালিকা ১০২

প্রকাশকের কথা

মেয়েটির নাম রূপ কানোয়ার। গ্রাম দেওরালা, জেলা শিকার, রাজস্থান, হিন্দুস্তান। বয়স আঠার। বিয়ে হয়েছে মাত্র আট মাস। বিয়ের শাড়িটা এখনো সযত্নে তুলে রাখা তোরঙ্গের ভেতর। মাঝে-মধ্যে বের করে দেখে। এখনও সন্তান আসেনি গর্ভে। কিন্তু হঠাৎ এক জীবননাশী ব্যামো হলো তার স্বামীর। লোকটা মারা গেলেন—মেরেও গেলেন।

এই সেদিনের ঘটনা! ১৯৮৭ সন। আমি নিজেও তখন এক দুরন্ত কিশোর। গ্রামের মেঠো পথ ধরে সেদিন হয়তো আমি স্কুলে যাচ্ছিলাম। আর এই আমার পাশেই, তখনও নারীকে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে— দাঙ্গা কিংবা যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রেক্ষিতে নয়,ধর্মীয়-সামাজিক প্রথা হিসেবে।

হ্যাঁ, হয়তো সেখানে ঢাক বেজেছে, ঢোল বেজেছে। হৈচৈ-উলুধ্বনি হয়েছে। শাঁখা বেজেছে। কাসার নাদে প্রাণে বাঁচার আকুতিকে ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা। আমি বাঁচতে চাই, আমি বাঁচতে চাই...। না তোকে বাঁচতে দেওয়া হবে না...। তুই অলক্ষ্মী, অপয়া...অসতী।

এই ঢাক-ঢোল, হৈচৈ উলুধ্বনি, ভুভুজেলার কর্ণবিদারী নিস্বন আমরা আবারও শুনতে পাচ্ছি— আমাদের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের প্রাঙ্গাণে। শব্দের পর্দার আড়ালে নারীর ইজ্জত লুণ্ঠনের জন্য—তার বাঁচার আকুতিটুকু কেউ যেন শুনতে না পায়।

নারীর প্রতি এই অবিচার, এই নিপীড়ন, এই নির্মমতা জাহিলী দুনিয়ার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। সেই চৌদ্দ'শ বছরের পুরনো আরব পৌত্তলিকতার সাথে এই বিংশ শতাব্দীর পৌত্তলিকতা মিলেমিশে যেন একাকার। কখনও নারীকে জীবন্ত পুড়িয়ে সতী করে, কখনও কন্যাশিশুকে জীবন্ত প্রোথিত করে কলঙ্ক মুছে ভারমুক্ত হয়। ইসলাম এসে সবসময়ই পাশে দাঁড়িয়েছে নারীর; বলেছে:

“স্মরণ করো, যখন জীবন্ত পুঁতে ফেলা কন্যা শিশুটিকে জিজ্ঞেস করা হবে, কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে?”

যে চারজন নারীকে ইসলামে শ্রেষ্ঠতম নারীর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, তাদের কাউকেই আগুনে পুড়ে সতী হতে হয়নি। শ্রেষ্ঠ তারা নিজ গুণে, নিজ মহিমায়—নারী হিসেবেই। কখনও কন্যা, কখনও জায়া, কখনও জননী।

ইসলাম ছাড়া সব সমাজই নারীকে নিপীড়ন করেছে—সেটা হোক পৌত্তলিকতা কিংবা ধর্মহীনতা; কেউ ছলে, কেউ বলে, কেউ কৌশলে। সেটা হোক নবী ‘ঈসা কিংবা উযায়েরকে আল্লাহর পুত্র বানানো পৌত্তলিকতার দেশে কিংবা তেত্রিশ কোটি দেবতাদের দেশে। সেটা হোক ঘোষিত ধর্মহীন নাস্তিকতা, কিংবা অধুনা ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের ধর্মহীনতা।

যে পশ্চিমারা নারীকে স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে স্বীকার করেছে এই সেদিন, তারা আজ আমাদেরকে নারী স্বাধীনতার সবক শেখায়। ইসলাম নারীকে যে অধিকার দিয়েছে চৌদ্দ’শ বছর আগে সম্মানের সাথে, পশ্চিমা সমাজে তা তাদেরকে ‘আদায়’ করে নিতে হয়েছে। হ্যাঁ, এই সেদিন মাত্র! ১৮৩৯ সনে আমেরিকার মিসিসিপি রাজ্যে সর্বপ্রথম নারীদেরকে নিজ নামে সম্পত্তি রাখার অনুমোদন দেওয়া হয়। বিবাহিত নারীদেরকে তো তারা দেখতো নিজ মালিকানাধীন লাইভস্টকের মতো। তাদের নিজ নামে কিছু থাকার নিয়ম ছিল না; তাদেরকে স্বতন্ত্রভাবে আর্থিক কোনো কিছু অধিকার করার অনুমতি দেওয়া হয় আরও পরে— ১৮৪৪ সনে। এরপর ১৮৪৮ এ নিউ ইয়র্কে পাস হয় ‘Married Woman’s Property Act’, আর যুক্তরাজ্যে নারীদের সম্পত্তি রাখার এ আইন পাস হয় আরও পরে ১৮৭২ এ।

পশ্চিমা এসব দেশে নারীদের এতই ‘স্বাধীনতা’ ছিল যে, প্রয়োজনে কাজ করতে চাইলে নিজ পেশাটুকু বাছাই করার মতো অধিকারও তাদের ছিল না। ১৮৭২ এ ইলিনয়েস রাজ্যে সর্বপ্রথম নারীদেরকে স্বাধীনভাবে পেশা পছন্দ করার অনুমতি দেওয়া হয়। ফ্রান্সে নারীদেরকে নিজ নামে ব্যাংক একাউন্ট খোলার সুযোগ দেওয়া হয় ১৮৮১ সনে; স্বামীর খোয়াড়ে থাকা নারীদের জন্য স্বামীর অনুমতি ছাড়া এই সুযোগটুকু পেতে আরও পাঁচ বছর অপেক্ষা করতে হয়। আমেরিকাতে এই অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া হয় প্রায় এক শতাব্দী পরে

একক বিবাহ পদ্ধতি

এ বইটি সংকলনের উদ্দেশ্য বহুবিবাহ[১] (তা'আদ্দুদ আয-যাওজাত) এর পক্ষে কিছু সাফাই গেয়ে সমর্থনের চেষ্টা করা নয়। কারণ স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই যেখানে এর অধিকার দিয়েছেন সেখানে কারও সমর্থন করা বা না করায় কিছুই আসে যায় না। কুরআনের আয়াতে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে:

"...তাহলে তোমরা বিয়ে করো নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভালো লাগে; দু'টি, তিনটি অথবা চারটি। আর যদি ভয় করো যে, তোমরা সমান আচরণ করতে পারবে না, তবে একটি।" (আন নিসা, ৪:৩)

বাস্তব জীবনধারার মাধ্যমে নবী ﷺ নিজে বহুবিবাহ চর্চার সঠিক উপায় সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে হাতে-কলমে দেখিয়ে গিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর অধিকাংশ সাহাবীও তা'আদ্দুদ বা বহুবিবাহ করেছেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ্‌র অনেক বিশিষ্ট আলিম একাধিক বিয়ে করেছেন। ইউরোপীয় উপনিবেশের পূর্বে ও পরে অধিকাংশ মুসলিম দেশের সাধারণ মুসলিমদের মধ্যেও বহুবিবাহের ব্যাপক প্রচলন ছিল। অথচ সাম্প্রতিক সময়ে তথাকথিত কতিপয় 'মডারেট মুসলিম'রা ইসলামে বহুবিবাহের সমর্থন ও তালাকের সহজতার কারণে ইসলামি বিবাহ পদ্ধতির ওপর ভয়ানক আক্রমণ চালাচ্ছে। ইসলামি বিবাহ পদ্ধতিকে তারা পশ্চিমাদের এককবিবাহ দ্বারা প্রতিস্থাপন করতে চায়। একক বিয়েকেই তারা বিয়ের একমাত্র ন্যায়সঙ্গত ও সভ্য ধরন মনে করেন। ফলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অনেক দেশেও রাষ্ট্রীয়ভাবে বহুবিবাহকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে; অন্ততঃপক্ষে কুফরী সমাজব্যবস্থার আদলে এর পরিসরকে খুব সীমিত করে দেওয়া হয়েছে। তবে বর্তমানেও বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম দেশে এখনো মানুষ বহুবিবাহের প্রথাকে ধরে রেখেছে; যদিও এর ব্যাপকতা আগের চেয়ে অনেক কমেছে।

[১] ওয়েবস্টের-এর 'New World Dictionary' অনুযায়ী polygyny হলো একই সাথে দুই বা ততোধিক স্ত্রী থাকা। আর polygamy হলো একইসাথে দুই বা ততোধিক স্বামী বা স্ত্রী থাকা।

খ্রিস্টধর্মে বহুবিবাহ

ইসলামের বিরুদ্ধাচরণকারীদের উত্থাপন করা কয়েকটি বিষয়ের সঠিক উত্তর দেওয়া প্রয়োজন। এগুলোর মধ্যে প্রথম মিথ্যা দাবীটি হলো, খ্রিস্টধর্মের মাধ্যমে প্রবর্তিত একক বিবাহ নারীদের অধিকার তো সংরক্ষণ করেই, উপরন্তু পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানবসমাজকে আরও সভ্য করে তোলার প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তার করে।

প্রথমত, ঈসা ﷺ বাইবেলের কোথাও বলেননি যে, পুরুষদের জন্য বহুবিবাহ নিষিদ্ধ; বরং ইহুদীদের রীতির[১] অনুসরণে প্রথম যুগের খ্রিস্টান পুরুষরাও বহুবিবাহ করত। কতিপয় চার্চের ফাদার ইহুদী আলিমদের বিরুদ্ধে যৌনলালসা চরিতার্থ করার অভিযোগ দায়ের করলেও কোন চার্চ পুরুষের বহুবিবাহের বিরোধিতা করেনি। যেসব জায়গায় বহুবিবাহের প্রচলন বেশি ছিল, সেখানেও তারা কোনোরূপ বাধার সৃষ্টি করেনি। এমনকি সেইন্ট অগাস্টিন প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি এ বিষয়টিকে মোটেও খারাপ মনে করেন না। একবার লুথার এর ব্যাপারে অনেক সহনশীল মনোভাব ব্যক্ত করেছেন এবং তিনি হেসের ফিলিপের দ্বিবিবাহকে অনুমোদন দিয়েছিলেন।

১৫৩১ সালে অ্যানাব্যাপ্টিস্ট প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন যে, একজন সত্যিকার খ্রিস্টানের অবশ্যই একাধিক স্ত্রী থাকা উচিত। ১৬৫০ সালের একটা সময় কিছু খ্রিস্টান বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বলেছেন যে, প্রত্যেক পুরুষকে অবশ্যই দুটি বিয়ে করতে দেওয়া উচিত। এমনকি ষষ্ঠদশ শতকেও কতিপয় জার্মান সংস্কারক মত দিয়েছেন যে, যদি প্রথম স্ত্রীর মধ্যে কোনো ত্রুটি থাকে এবং পরবর্তী ক্ষেত্রেও যদি ত্রুটি থেকে থাকে, তবে একসাথে দুটি বা তিনটি স্ত্রী রাখা অনুমোদিত।[২]

---

[১] সব বিচারকদের অবশ্যই একাধিক স্ত্রী থাকতে হবে (বিচারক ৮:৩০, ১০:৪৫, ১২:১৪)। বর্ণিত আছে, বাদশা সোলাইমানের ৭০০ জন স্ত্রী এবং তিনশ জন উপপত্নী ছিল। (রাজা ৯:১৬, ১১:৩ সোলেমনের গল্প, ৬:৮)। তাঁর পুত্রের ছিল আঠারো জন স্ত্রী এবং আটাশ জন উপপত্নী। (২ ক্রনিকল, ১১:২১)। রিহোবমের আটাশ পুত্রের প্রত্যেকের অনেকজন স্ত্রী ছিল (২ ক্রনিকল, ১১:২১)। তালমুদের বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেছেন, ইয়াকুবের যে ক'জন স্ত্রী ছিল তার চেয়ে বেশি অর্থাৎ চারটির বেশি বিয়ে করা উচিত নয়।

[২] হাম্মুদাহ 'আব্দুল আতি, The Family Structure in Islam, (American Trust Publication, ১৯৭৭), পৃ. ১১৪।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামে বিবাহ

ইসলামে বিবাহ

সন্তান জন্মদানের মাধ্যমে পৃথিবীতে মানুষের জীবনধারা ও বংশ পরম্পরা বজায় রাখার একমাত্র পন্থা হিসেবে আল্লাহ তা'আলা বিয়ের বিধান দিয়েছেন। মুসলিম জাতি বা মুসলিম সমাজের মৌলিক একক হলো পরিবার। আল্লাহ তা'আলা মানবজাতি ও জীবজন্তুর মধ্যে সঙ্গী ও সন্তানের প্রতি একটি সহজাত আকাঙ্ক্ষা দিয়েছেন। পৃথিবীতে জীবনের ধারা তথা বংশধারা অব্যাহত থাকে সন্তানদের মাধ্যমে; আর সন্তান হলো বৈবাহিক বন্ধনের ফসল। তবে, ইসলামে বিয়েকে শুধু নারী-পুরুষের মিলন ও সন্তান জন্মদানের উপায় হিসেবে দেখা হয় না। বিয়ের বিধানকে শুধুমাত্র জৈবিক চাহিদা পূরণ করার উপায় হিসেবেও জারি করা হয়নি। নিছক বস্তুগত স্বার্থ থেকে এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আরও অনেক গভীর। মহান আল্লাহ এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন:

"আর তাঁর একটি নিদর্শন হলো, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে গিয়ে প্রশান্তি লাভ করতে পারো। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও অনুকম্পা সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এর মধ্যে চিন্তাশীলদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।" (আর রূম, ৩০:২১)

আয়াতে উল্লিখিত এ 'সুকুন' বা প্রশান্তি জৈবিক চাহিদা পূরণ করার মাধ্যমে যে আনন্দ অনুভূত হয় নিছক সেটুকুই নয়, বরং এর মধ্যে মানসিক প্রশান্তি, হৃদয়ের তৃপ্তি ও জীবনের স্থিতিশীলতাও অন্তর্ভুক্ত। প্রতিটি মানুষই তার নিজের মধ্যে একটা শূন্যতা অনুভব করে, যেটা পূরণ হওয়া প্রয়োজন। এটা মানুষের সৃষ্টিগত দুর্বলতা; এ দুর্বলতাকে কাটিয়ে ওঠা আবশ্যক। আর এ একাকীত্ব, এ দুর্বলতা কেবল এমন একজন মানুষের সঙ্গ দ্বারাই পূরণ হওয়া সম্ভব– যে মানুষটি তার সাথে সত্যি জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনী হিসাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এর দ্বারা মানুষ যে স্থিরতা, শান্তি ও স্বস্তি লাভ করে সেটাকেই 'সুকুন' বা প্রশান্তি বলা হয়েছে। বিয়ে শুধুমাত্র শরীর দেওয়া-নেওয়ার বৈধতা অর্জনের লাইসেন্স প্রাপ্তি নয়; বরং এটি নারী, পুরুষ এবং তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকারকে সংরক্ষণ করার একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিধান।

নবী ﷺ বিয়ের গুরুত্বকে এভাবে ব্যক্ত করেছেন,

"আল্লাহর কোনো বান্দা যখন বিয়ে করে তখন সে দ্বীনের অর্ধেক পূর্ণ করে এবং বাকি অর্ধেক পূরণ করার জন্য তার অবশ্যই উচিত আল্লাহকে ভয় করা।"[১]

অস্থায়ী সম্পর্কের চেয়ে বিয়ে উত্তম

বিয়ে এমনই একটি সুগভীর সম্পর্কের জন্ম দেয় যা পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সম্মান, ভালোবাসা ও মায়া-মমতার সুতোয় গাঁথা। বিধি-নিষেধহীন অস্থায়ী সম্পর্কের সাথে এর কোনো তুলনাই চলে না। সমাজের মৌলিক একক পরিবারকে সংরক্ষণের মাধ্যমে বিয়ে অত্যন্ত সফলভাবে একটি সমাজকে স্থিতিশীল রাখে। যে সমাজ নারী-পুরুষের সম্পর্কের আইনগত মর্যাদা দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করে না, যার সাথে খুশী জৈবিক চাহিদা পূরণের বৈধতা দেয়; সে সমাজ কোন অবস্থায় গিয়ে দাঁড়াবে! যেসব নারী ও শিশুকে পারিবারিক শিক্ষা, বন্ধন, আত্মসম্মান ও কোনো ধরনের অবলম্বন ছাড়া ছেড়ে দেওয়া হয় তাদের কী হবে? এ সমাজের অবস্থা তো সেই পশু-সমাজের চেয়েও নিকৃষ্ট হবে, যাদের অন্তত নিজের সঙ্গী ও বাচ্চাদের রক্ষা করার সহজাত প্রবণতা আছে। তাই ইসলামে সমাজকে রক্ষা করার জন্য বিবাহের ওপর অনেক বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যারা বিয়ের বিরোধিতা করে তাদেরকে নবী ﷺ পথভ্রষ্ট বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন,

"বিয়ে আমার সুন্নাহ। যে আমার সুন্নাহকে অপছন্দ করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"[২]

---

[১] বায়হাকিতে সংগৃহীত (জ্যামস রবসন, মিশকাত আল মাসাবিহ), ইংরেজি অনুবাদ, লাহোর; শেইখ মোহাম্মদ আশরাফ পাবলিশার্স, ১৯৭৫, খণ্ড ১, পৃ. ৬৬০) এবং শেখ আলবানী তার সাহিহ আল-জামি আস-সাগির, খণ্ড ১, পৃ. ১৩৬-৭, হাদীস নং ৪৩০।

[২] হাদীসটি আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। সহীহ বুখারী, [মুহাম্মাদ মুহসিন খান, সহীহুল বুখারী, (আরবী-ইংরেজী অনুবাদ), রিয়াদ; মাক্তাবাহ আর-রিয়াদ আল-হাদীস, ১৯৮১, খণ্ড ৭, পৃ. ১-২, হাদীস নং ১]; সহীহ মুসলিম (ইংরেজি অনুবাদ), লাহোর: শ. মুহাম্মাদ আশরাফ পাবলিশার্স, ১৯৮৭,

তা‘আদ্দুদ: বহুবিবাহ

একটু গভীরভাবে ইসলামের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাবো যে, এর পরতে পরতে মুমিন নারীদের অবদান ও প্রভাব অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। সংকটে-সম্ভাবনায় তারা স্বামীর ওপর আস্থা রেখেছে, বিপদে-আপদে তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়েছে, সাহস যুগিয়েছে, চরম দারিদ্রতা ও কষ্টকে হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছে, নিজেদের সবটুকু উজাড় করে দিয়ে স্বামীর সেবা করেছে, এমনকি প্রয়োজনে রণাঙ্গানে স্বামীদের পাশাপাশি বীরাঙ্গানার ভূমিকায়ও অবতীর্ণ হয়েছে। একই সাথে তারা হচ্ছেন এমন নারী যারা আল্লাহর নির্দেশ মাথা পেতে নিয়ে স্বেচ্ছায় নিজেদের রূপ-সৌন্দর্যকে পরপুরুষের কাছ থেকে গোপন রেখেছে। গোটা জাতিকে ইসলামের স্বরূপ দেখিয়ে দেওয়ার জন্য কঠোর সাধনা করেছে। তারা কখনোই অর্থ-বিত্ত, দুনিয়ার চাকচিক্য দ্বারা প্রলুব্ধ হননি। এর কোনো কিছুই তাদের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে বাধা হতে পারেনি; তারা ইসলামি সীমারেখার মধ্যে থেকেই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন।

তারপরও বর্তমানে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়, বিবাহিত পুরুষদেরকে কোন ধরনের নারীরা বিয়ে করবে! অথচ তারা চিন্তা করে না যে, এর উত্তর খোঁজার জন্য নবী ﷺ ও বিশিষ্ট সাহাবীদের স্ত্রীদের থেকে খুব বেশি দূরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু রাসূল ﷺ, সাহাবাগণ এবং তাঁদের স্ত্রীদের কথা বললেই আজকাল চট করে লোকেরা যে কথা বলে থাকেন তা হলো— “সেটা ছিল একটা অন্য রকম সময়; তখন নারীরা এতে অভ্যস্ত ছিলো, সে যুগের সাথে কি বর্তমান সময়ের কোনো মিল আছে?” সম্ভবত তারা জানে না যে, ইসলামের প্রতিটি বিধান পৃথিবীর শেষ দিনটি পর্যন্ত প্রত্যেক যুগের জন্য শাশ্বত ও কল্যাণকর বিধান। ইসলাম কোনো নির্দিষ্ট সময় বা স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা সকল যুগের সকল পরিস্থিতির জন্য প্রযোজ্য। কোনো ব্যক্তি যদি সত্যিকার অর্থে নিজেকে মুসলিম দাবী করতে চান তাহলে তার জন্য এটা অস্বীকার করার সুযোগ নেই যে, আল্লাহ তা‘আলা তাঁর শেষ ওয়াহি, শেষ নবী ﷺ এবং শেষ জীবনবিধান অবতীর্ণ করেছেন এবং তিনি ঘোষণা

করেছেন যে, তাঁর কাছে একমাত্র মনোনীত জীবনব্যবস্থা হলো ইসলাম:

“…আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের ওপর আমার নি‘আমত সম্পূর্ণ করলাম; এবং তোমাদের জন্য জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলামকে মনোনীত করলাম…।” (আল মায়েদা, ৫:৩)

“আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন জীবনব্যবস্থা অনুসরণ করতে চায়, তবে তার কাছ থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।” (আল ইমরান, ৩:৮৫)

পুরুষদের জন্য বহুবিবাহের বৈধতা

আল্লাহ তা‘আলা পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন যে, তিনি যেটাকে বৈধ করেছেন সেটাকে যেন কিছুতেই অবৈধ করা না হয়। যারা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহ্‌র অনুসরণ করতে চায়, আল্লাহর দেওয়া কোনো একটি সুযোগ গ্রহণ করতে চায়, তাদেরকে অভিযুক্ত করা এবং দোষী সাব্যস্ত করা কোনো মুসলিম দাবীদার ব্যক্তির জন্য মোটেও শোভনীয় নয়। বহুবিবাহ করা কোনো ধরনের নৈতিক অবক্ষয় নয় বা কোনো অবৈধ সম্পর্ক করাও নয়; বরং ইসলামি পারিবারিক জীবনের একটি বৈধ অংশ। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

“…তোমরা বিয়ে করো নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভালো লাগে; দুটি, তিনটি অথবা চারটি। আর যদি ভয় করো যে, তোমরা সমতা রক্ষা করতে পারবে না, তবে একটি; অথবা তোমাদের দাসীদেরকে গ্রহণ করতে পারো। এটা তোমাদের সীমালংঘন না করার অধিকতর নিকটবর্তী।” (আন নিসা, ৪:৩)

এখানে লক্ষণীয় যে, প্রথমে দুটি, তিনটি বা চারটি বিয়ে করার কথা বলা হয়েছে। আর সে যদি একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সমতা রক্ষা তথা ইনসাফ কায়েম করতে অক্ষম হয়, তাহলেই কেবল তাকে একটি বিয়ে করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তবে, এর অর্থ এ নয় যে, ইসলাম সব পুরুষদের জন্য একাধিক বিয়ে বাধ্যতামূলক করেছে। বরং যারা উল্লিখিত শর্ত পূরণে সক্ষম তাদের জন্য এটি একটি বৈধ ও উত্তম সুযোগ। আবার যেসব সমাজে অনিয়ন্ত্রিতভাবে বহুবিবাহের প্রথা চালু আছে, সেখানে বিয়ের অনুমোদিত সর্বোচ্চ সংখ্যাকে চারটির মধ্যে